জীবনের উদ্ভবের সম্ভাব্য ধারনাগুলো

(প্রানের প্রান জাগিছে তোমারি প্রানে -৩)

অভিজিৎ রায়

পূর্ব্ববর্তী পর্বের পর হতে...

চারিদিকে শান্ত বাতি ভিজে গন্ধ-মৃদু কলরব;
খেয়া নৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;
পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল;-
এশিরিয়া ধুলো আজ ব্যাবিলন ছাই হ'য়ে আছে।
--জীবনানন্দ দাশ

জীববিদ্যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল -'কি ভাবে, কখন আর কোথায় প্রথম প্রাণের উৎপত্তি হল?'। এ প্রশ্নগুলো জীববিজ্ঞানের চিরন্তন এবং মৌলিক প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, প্রাণিবিজ্ঞানী, রসায়ন বিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানী সবাই বরাবর হিমসিম খেয়েছেন। এমন কি ডারউইন নিজেও একসময় বলেছিলেনঃ 'বর্তমানকালে জীবনের উৎপত্তি নিয়ে ভাববার মত বাজে কাজ আর কিছুই নেই, তার চেয়ে বরং বস্তুর উৎপত্তি নিয়ে ভাবা যেতে পারে' (It is mere rubbish thinking at present of the origin of life; one might as well think about the origin of matter)। এর কারণ হল জীবনের উৎপত্তিসূচক প্রশ্নগুলো শুনতে যত সহজ সরল শোনায়, এ গুলোর সমাধান কিন্তু এত সোজা নয়; এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অন্তর্নিহিত নানা জটিলতা। তারপরেও মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন বসে থাকে নি। আজানাকে জানবার আগ্রহে উত্তর খুঁজে নিতে চেয়েছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু জীবনের 'গোলোকধাঁধা'র সমাধান তো এত সহজ নয় যে 'জলবৎ তরলং' এর সমাধান পেয়ে যাবে, যদিও মানুষ কিন্তু প্রতিনিয়তই আশাবাদী। এ প্রসঙ্গে জেডি বার্ণলের উক্তিটি স্মর্তব্য ঃ

> Life is beginning to cease to be a mystery and becoming practically a cryptogram, a puzzle, a code that can be broken, a working model that sooner or later can be made.

বার্নাল এ উক্তিটি করেছিলেন ১৯৬৭ সালে; এর পর কয়েক দশক পার হয়ে গেছে। তারপরও জীবনের সঠিক সংজ্ঞা আর উৎপত্তির ইতিহাস সঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে কি? আসলে জীবনের উৎপত্তিকে বুঝতে হলে জড় জগতে আর জীবজগতে বিবর্তনকে খুব ভালভাবে বোঝা ছাড়া গতি নেই। জড় জগতে বিবর্তন বলতে আমি মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং তার ধারাবাহিক ক্রমবিকাশকে বুঝাচ্ছি। আজ থেকে মোটামুটি সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। কিভাবে মহাবিস্ফোরণ থেকে শুরু করে প্রথমিক কনিকার উৎপত্তি, তারপর ধীরে ধীরে এক সময় শক্তির প্রাধান্য অতক্রম করে শুরু হল পদার্থের প্রাধান্য, সেই থেকে শুরু করে তারামন্ডল, কোয়েসার, ছায়াপথ, সূর্য, সৌরজগৎ, সবকিছু পার হয়ে কিভাবে অবশেষে আমাদের এ পৃথিবীর জন্ম হল তার একটি পর্যায়ক্রমিক ধারণা প্রথম গ্রন্থকার তার 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' বইটিতে (অঙ্কুর প্রকাশনী; ২০০৫, ২০০৬) দিতে চেষ্টা করেছে। উক্ত বইটিকে জড়জগতে বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত প্রকাশ হিসেবেও ধরা যেতে পারে। তবে জড়জগতে বিবর্তনই কিন্তু সবটুকু নয়। প্রাণের উৎপত্তি আর জীবজগতে বিবর্তনের ইতিহাসটা না তুলে ধরলে গল্পটি অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। বাস্তবে বিবর্তন যে অনুক্রমে ঘটেছে তা হল :

জড় জগতে বিবর্তন –> প্রাণের উৎপত্তি –> প্রজাতির উৎপত্তি –> মানুষের উৎপত্তি

তবে এ বইটিতে আমাদের আলোচনা মূলতঃ প্রাণের উৎপত্তির বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে।

সেই সাড়ে চারশ কোটি বছর আগেকার পৃথিবী কিন্তু কোন দিক দিয়েই আজকের পৃথিবীর মত ছিল না। তখন পৃথিবীতে কোন প্রাণ ছিল না। পৃথিবী ছিল প্রচন্ড উত্তপ্ত, আর আকাশ আর পৃথিবী পরিপূর্ণ ছিল বিষাক্ত গ্যাসে। তারপর একসময় অনেককিছুর বদল হল, পৃথিবীও একসময় বারিধারায় শীতল হল। এমনি এক পরিস্থিতিতে এককোষী জীবের উদ্ভব ঘটল। তবে ঠিক কোন মহেন্দ্রক্ষণে এককোষী জীবের উৎপত্তি আর তারপর সেই আনন্দধারা ক্রমাগত বহুকোষে ছড়িয়ে দিয়ে সবুজ গাছপালাকে আন্দোলিত করেছে, কিংবা পাখির কূজনে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলেছে তা আর আজ হলফ করে বলা যবে না। এ পৃথিবীতে জীবনের প্রথম আবির্ভাব সম্পর্কে অনেক অনুকল্প আছে। এগুলোকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮) :

১) ***অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা :*** জীবনের আবির্ভাব হয়েছে অতিপ্রাকৃতিক (supernatural) ও অজ্ঞেয় ঘটনা হিসেবে।

২) ***সৃষ্টিবাদ :*** বিশেষ লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে, বিরাট কোন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জীবনের সৃষ্টি করা হয়েছিল। এর নাম সৃষ্টিবাদ বা বিশেষ সৃষ্টি তত্ত্ব (Theory of special creation)।

৩) ***স্বতঃজননবাদ :*** স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ময়লা-আবর্জনা থেকে প্রাণের সৃষ্টি হয়। এধারণাকে বলে স্বতঃজনন তত্ত্ব (Theory of spontaneous generation)।

৪) ***বহির্জগতে উৎপত্তি :*** এ ধারণা অনুযায়ী জীবন পৃথিবীর বহিস্থঃ (Extra terrestrial) পরিবেশ থেকে। ধারনা করা হয় পৃথিবীর বহির্জগতে কোথাও না কোথাও প্রাণ চিরকালই ছিল, আর সেখান থেকেই পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে।

৫) ***জৈব রাসায়নিক তত্ত্ব :*** রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আদিম পরিবেশে অজৈব (জড়) বস্তু হতে পৃথিবীতেই জীবনের উৎপত্তি হয়েছে। এই তত্ত্বের নাম জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব (Chemical theory of origin of life)। এ তত্ত্বের অপর একটি নাম অজীবজনি (Abiogenesis)।

প্রথমোক্ত দুটি অনুকল্প বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না। এই তত্ত্ব দুটি আসলে মনে করে বিশাল পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ঈশ্বর পৃথিবীতে একসময় প্রাণ সৃষ্টি করেন। কিন্তু এই তত্ত্বগুলোর কোন অবরোহ বা অনুসিদ্ধান্ত নেই, কিংবা থাকলেও তা পরীক্ষা, নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ দ্বারা যাচাই করা যয় না। তবে ৭ দিনে বিশ্ব সৃষ্টির বাইবেলীয় সৃষ্টিবাদের যে ব্যাখ্যা ফাদার সুয়ারেজ দিয়েছেন বা সৃষ্টি মুহূর্তের তারিখ হিসেবে আর্চ বিশপ উশার যা বলেছেন (সকাল ৯-৩০, মঙ্গলবার, ২০০৪ খ্রীঃ পূ) তাকে বিজ্ঞান সঠিক মনে করে না। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ফসিলাদি পর্যবেক্ষণ করে এবং অন্যান্য পরীক্ষার সাহায্যে তাঁদের ধারণার অসারতা প্রমাণিত হয়। আর তাছাড়া বিজ্ঞান অজ্ঞেয়বাদী নয়। বিজ্ঞান খুব কঠোরভাবেই বস্তুবাদী। প্রাণের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তা প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতেই বিজ্ঞান জানতে চায়। আধুনিক বিজ্ঞান জন্ম নিয়েছে যাদের হাত দিয়ে তারা মধ্যযুগীয় ভাববাদ আর অজ্ঞেয়বাদের তীব্র বিরোধী ছিলেন। বেকন, দেকার্ত, নিউটন, গ্যালিলিও, কেপলার মিলে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের সংস্কৃতি গড়েছেন, যন্ত্রসভ্যতার দার্শনিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। পরে বিকশিত হয়েছে রসায়নবিদ্যা আর তার সাথে সাথে জীববিদ্যা। কিন্তু প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে

কোন সঠিক ধারণা তখনও মানুষের মনে ছিল না। 'নিম্ন'শ্রেনীর প্রাণী যেমন কীট পতংগ স্বতঃস্ফুর্তভাবে মাটি, কাদা ময়লা আবর্জনা থেকে জন্ম নেয় - এই বিশ্বাস প্রাচীন চীন, ভারত আর মিশরে আমরা দেখতে পাই। এর কারণও ছিল। আবর্জনা কাদার মধ্যে কীটের ডিম পারার ফলে তা থেকেই যে কীটের জন্ম হয়, তা জানতে হলে যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তা তখনকার দিনে ছিল না। ফলে জীবনের উৎপত্তির এই স্বতস্ফুর্ত তত্ত্ব দীর্ঘকাল মানব সমাজে রাজত্ব করেছে। এমনকি শ'চারেক বছর আগেও যখন আধুনিক বিজ্ঞান যাত্রা শুরু করে তখনও এই স্বতঃস্ফুর্ততত্ত্ব (Theory of spontaneous generation) বহাল তবিয়তেই রাজত্ব করছে। শুধু রোগ জীবাণু বা আণুবীক্ষণিক জীবের ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি বড় বড় প্রাণীর ক্ষেত্রেও*। ব্রিটিশ গবেষক আলেকজান্দার নীডহ্যাম (১১৫৭-১২১৭) বিশ্বাস করতেন ফার গাছ সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে ফেলে রাখলে তা থেকে রাজহাঁস জন্ম নেয়। জ্যান ব্যাপটিস্ট হেলমন্ট (১৫৮০-১৬৪৪) ভাবতেন ঘর্মাক্ত নোংরা অন্তর্বাস ঘরের কোনায় ফেলে রাখলে তা থেকে ইঁদুর আপনা আপনিই জন্ম নেয়! ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় মূলতঃ লুই পাস্তুরের গবেষণার মধ্য দিয়ে আমরা এই পুরোন ধারণা ছেড়ে দেই (পরবর্তী অধ্যায়ে স্বতঃস্ফুর্ততত্ত্ব এবং এর মৃত্যু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে যখন স্বতঃজননবাদ গ্রহনযোগ্য বিবেচিত হচ্ছিল না, তখন অন্য একটি অনুকল্প প্রস্তাবিত হয়। তার মূল কথা হল জীবনের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল মহাবিশ্বে। সেখান থেকে পৃথিবীতে জীবন এসেছে। এ অনুকল্পের নাম বহির্বিশ্বে জীবনের উৎপত্তি (Extra terrestrial origin of life)। প্রথম দিকে রিখটার, আরহেনিয়াস (তাঁর অনুকল্পের নাম ছিলো 'প্যানস্পার্মিয়া', এ বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে) এবং পরবর্তীতে ব্রুকস, শ', ক্রিক, হয়েল, বিক্রমসিংহ প্রমুখ এই তত্ত্বের প্রচারক ছিলেন। তাদের মতে পৃথিবীর বাইরে কোন গ্রহে বা অন্য কোথাও জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল। সেখান হতে প্রাণ স্পোর বা অনুবীজ হিসেবে পৃথিবীতে এসেছিল। কিন্তু

* জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বা আপনা আপনি উৎপত্তির ধারণা কিন্তু বহু প্রাচীন। এর প্রমাণ এরিস্টটলের লেখায়ও রয়েছে। যদিও এ কথা তাঁর জানাই ছিল যে জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি হয়, তবুও এরিস্টটল কোন কোন ছোট প্রাণী (যেমন কিছু মাছ এবং পতংগ) স্বতঃস্ফুর্তভাবে উদ্ভুত হয় বলে বিশ্বাস করতেন। তার বিখ্যাত বই প্রাণীজগতের ইতিহাস (Historia Animalium)-এ এধরণের একটি বিবরণ দিয়েছেন :

> 'আধিকাংশ মাছের জন্ম ডিম থেকে হয়ে থাকে। তবে এমন কিছু মাছ আছে যেগুলোর জন্ম হয় কাদা ও বালি থেকে। একবার নিডোসের কাছে একটি পুকুর শুকিয়ে যায়। এর তলদেশের কাদা শুকিয়ে যায়। তারপর বেশ কয়েকদিন পর বৃষ্টিতে পুকুরটি ভরে যায়। এ দেখা গেল পুকুরে জন্মেছে নানা রকমের 'মূলেট জাতীয়' ছোট মাছ। কাজেই এটি পরিস্কার যে কিছু মাছ স্বতঃস্ফুর্তভাবে জন্মায়। তার জন্য ডিমের বা যৌন ক্রিয়ার দরকার হয় না।'

আজকের দিনের জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে এরিস্টটলের এ বর্ণনা হয়ত হাসির খোরাক যোগাবে।

মহাশূন্যের পরিবেশ এই আন্তঃগ্রহ পরিভ্রমনের জন্য এতই প্রতিকুল (নিম্নমাত্রার তাপ, বায়ুর অনুপস্থিতি, উচ্চশক্তির বিকিরণ, অকল্পনীয় দূরত্ব ইত্যাদি) যে এভাবে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ এবং টিকে থাকার সম্ভাবনা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। কার্ল স্যাগান আর শকোভস্কি ১৯৬৬ সালে অনুজীবের আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিভ্রমণের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তারা হিসেব করে দেখিয়েছেন, অণুজীবগুলো যদি এক মাইক্রনের কম হয় তবে সেগুলোর পক্ষে পৃথিবীতে জীবন ধারণের উপযোগী অঙ্গাণুধারণ করা সম্ভব নয়। আবার অণুজীবগুলো যদি এক মাইক্রনের বেশী হয় তবে পৃথিবীর মত অন্য কোন গ্রহ থেকে এই ধরোনের প্রাণকণা নির্গত হয়ে পৃথিবীতে চলে আসা খুবই কঠিন। আর বিকিরণজনিত বিভিন্ন কারণে সেগুলোর পুড়ে যাবার সম্ভাবনা তো আছেই। তারপরও তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ঠিক ঠিক এক মাইক্রনের অনুজীবেরা কোন না কোন ভাবে পৃথিবীতে আসতে সক্ষম হয়েছিলো, স্যাগান আর শকোভস্কি হিসেব দিয়েছেন যে, পৃথিবীকে একশ' কোটি বছরে একটি মাত্র এ ধরণের স্পোর পেতে হলে আমাদের গ্যালাক্সির ১০০টি প্রাণধারণক্ষম গ্রহকে একসাথে ১০০০ টন অনুবীজ ছড়াতে হবে। কিন্তু আমাদের গ্যালাক্সিতে এ ধরনের ১০০টি গ্রহ তো দূরের কথা, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন জীবনবাহী গ্রহের সন্ধানই এখনো মেলেনি। আর তাছাড়া যদি ধরেই নেওয়া হয়, বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিয়ে প্রাণের বীজ এ পৃথিবীতে এসেছিল, তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায় বহির্বিশ্বেই বা কি ভাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল? তার মানে পৃথিবীর ক্ষেত্রে যে সমস্যাটির সমাধান করা যাচ্ছিল না, বহির্বিশ্বের দিকে ঠেলে দিয়ে সেই সমস্যাটিকে পেছানোর প্রয়াস নেয়া হল মাত্র।

পৃথিবীতে প্রতি নিয়ত উল্কাপিন্ড আছরে পড়ছে পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই আমরা এধরনের খবর দেখতে পাই। এগুলোকেই প্রাথমিকভাবে প্রাণ কণার বাহন বলে মনে করেন বহির্বিশ্বে জীবনের উৎপত্তি তত্ত্বের প্রবক্তারা। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সমস্ত অ্যামাইনো এসিড উল্কাপিন্ডের উপর ভর করে এই পৃথিবীতে এসেছে সেগুলোর সাথে পৃথিবীতে তৈরী অ্যামাইনো এসিডের পার্থক্য রয়েছে বিস্তর। মহাকাশের উল্কাপিন্ডের সাথে আসা অ্যামাইনো এসিডগুলোর মধ্যে কিছু বামাবর্তী এবং কিছু ডানাবর্তী (left and right-handed); ফলে এগুলোর কোন আলোক ক্রিয়া নেই। কিন্তু পৃথিবীতে প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরী অ্যামাইনো এসিডগুলো সবই বামাবর্তী (left-handed)। এ ছাড়া এমন কিছু অ্যামাইনো এসিড উল্কাপিন্ডে পাওয়া গেছে যেগুলো পৃথিবীর কোন জীবে দেখা যায় না। তাই অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন এ সব অ্যামাইনো এসিড থেকে পৃথিবীর অ্যামাইনো এসিড তৈরী হতে পারে না।

আসলে এ পৃথিবীতেই আদিম অবস্থায় অজৈব পদার্থ হতে জীবনের উৎপত্তি হয়েছে এবং তা কোন রহস্যজনক কারণে নয়, বরং জানা কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে - জীবনের এই রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্বকেই (Chemical theory of origin of life) আজ পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন। গত শতকের শেষভাগে থমাস হাক্সলি আর জন টিন্ডেলের গবেষণায় জীবনের এই বস্তুগত ভিত্তির কথা সাধারণভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তারপরও অনেকটাই ধোঁয়াটে ছিল সবকিছু। ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটেছে, কাটছে। হাক্সলির উত্তরসূরীরা যেমন হার্ডি, উইলসন, বার্নাল, হলডেন, কেলভিন, ওপারিন, মিলার, ইউরে, ডবঝানোস্কি প্রমুখ বিজ্ঞানীরা মানব মনের কুয়াশা কাটিয়ে জীবনের এই বস্তুবাদীরূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

আমরা আগামী অধ্যায়ে এ তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

পুনর্লিখন : ৮/৮/২০০৬

{তৃতীয় অধ্যায়, *প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী প্রকাশিতব্য}

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...